দুর্নীতিমুক্ত হোক বাংলাদেশ

ম. জাভেদ ইকবাল

দেশে যতগুলো সমস্যা জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি, ন্যায়বিচার ও সুশাসনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি তার মধ্যে একটি।জনসংখ্যাধিক্য ও ছোট আয়তনের এ দেশটিতে দারিদ্র্য ও সম্পদের অভাবের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই দুর্নীতি চলে আসছে। দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায়নি। জীবনযাত্রার মানও হয়েছে নিম্নগামী।

দুর্নীতির ধারণাসূচকে দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে, ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার'। আর ধারণাসূচক অনুযায়ী, গত ১৬ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল ২০২৩ সালে। বিগত সরকারের আমলে সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির মহোৎসব চলতে দেখা গেছে। দুর্নীতির মাত্রা কোনো দেশে কেমন, সে সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে জার্মানির বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। ২০২৩ সালের জন্য দুর্নীতির ধারণাসূচক অনুযায়ী, দুর্নীতির মাত্রা বিশ্বের যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এর আগে ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন রয়েছে, সেসব দেশের চেয়েও বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা বেশি। দুর্নীতি বেশি এমন দেশের তালিকায় ২০০৮ সালে দশম স্থানে ছিল বাংলাদেশ। এরপর ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ঘুরেফিরে ১২ থেকে ১৭ এর মধ্যে ছিল। এবার তা ১০-এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ ধারণাসূচক অনুযায়ী, দেশে দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে। টিআইয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শুধু আফগানিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে দুর্নীতির হার বেশি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশকে কি একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব? সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে ২৮ উপায়ে দুর্নীতির মাধ্যমে ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি। প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা ৬০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে প্রায় ১৪ থেকে ২৪ বিলিয়ন ডলার (১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা) রাজনৈতিক চাঁদাবাজি, ঘুষ এবং বাজেট বাড়ানোর মতো বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে নষ্ট হয়েছে। এতে বলা হয় রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাংকিং খাতের সংকটকে গভীর করেছে। ১৫ বছরে দেশের ব্যাংক খাতে যে মন্দ ঋণ তৈরি হয়েছে, তা দিয়ে ১৪টি মেট্রোরেল বা ২৪টি পদ্মা সেতু করা যেত।

দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে আইডিবি, এডিবিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও নীতিনির্ধারকরা দীর্ঘদিন ধরেই সব সরকারকেই দুর্নীতি হ্রাস করার উপায় হিসেবে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। টিআইবিও বিভিন্ন সময়ে সভা, সেমিনার ও রিপোর্টের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে নানাভাবে বিগত সব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন একটা হয়নি। অর্থাৎ দেশ এখন পর্যন্ত দুর্নীতিমুক্ত হতে পারেনি। দুর্নীতিগ্রস্তরা পদের কারণে যেমন ক্ষমতাবান, তেমনি তাদের রাজনৈতিকভাবে সহায়তা দেয়া হয়।

ভোগবাদী মানসিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অভাব দুর্নীতির পেছনে দায়ী। তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখলে বোঝা যায় ভোগবাদী মানসিকতাই দায়ী। বাংলাদেশে বর্তমানে সব শ্রেণির ব্যক্তিরাই ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। তবে উচ্চ পর্যায়ের কর্তারা মূলত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে গিয়ে ঘুষ গ্রহণকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করে। মধ্যবিত্তরা ও নিম্নবিত্তরাও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। দেখা যায় যে প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষ ঘুষ খেয়ে থাকে।

যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩' শীর্ষক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রতিবেদনে। গত ৩ ডিসেম্বর টিআইবির প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে গত বছর দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। সেবা খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয় বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে। এরপর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংকিং ও স্থানীয় সরকারের মতো খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা খাতে উন্নতি খুবই নগণ্য এবং এখনো সর্বোচ্চ উদ্বেগজনক অবস্থায়ই রয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গঠিত একটি কমিশন। এটি ২০০৪ সালের ৯ মে মাসের দুর্নীতি দমন আইন অনুসারে কার্যকর হয়েছে। একজন চেয়ারম্যান ও দুজন কমিশনার নিয়ে গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয় ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। এ সংস্থার লক্ষ্য হচ্ছে দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধ করা। দুদক আইন - ২০০৪ ও দুদক বিধিমালা - ২০০৭ অনুসারে সরকারি চাকরিজীবীদের দায়িত্ব পালনের সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ বা উপঢৌকন গ্রহণ ও বেআইনিভাবে নিজ নামে কিংবা বেনামে অবৈধ সম্পদ অর্জন মতো বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার গুরুদায়িত্ব দুদকের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু দুদক বাংলাদেশের বড় কোনো কর্মকর্তাকে এমন অপরাধে শাস্তি দিয়েছে

এমন ঘটনা বিরল। আবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যদি অনুমতি ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন দুদকে আইনে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করলেও সমাজে দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় জনগণ এর সুফল পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছে না। দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে সব কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির যথাযথ ব্যবস্থা করা; দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বৈষম্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন; সর্বদা দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া এবং দুর্নীতিবিষয়ক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা জরুরি। দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারসহ কার্যকর গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতির প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন ও তা দূর করতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরি। তা ছাড়া গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া; সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন করা এবং সর্ব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোও আবশ্যক।

রাজনৈতিক দল, জনপ্রতিনিধি, সরকার ও সরকারের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখতে পারে। ক্ষমতার উৎস যে জনগণ, তা যেন সরকার ও জনগণ ভুলে না যায়। এর জন্য গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণভিত্তিক প্রচারণা ও চাহিদা জোরদার করার সামাজিক আন্দোলনটি কার্যকর রাকা জরুরি। তরুণ সমাজ এগিয়ে এল কাজটি আরও সহজ হবে।দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা ও সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরি। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং জনস্বার্থে এর কুফল সম্পর্কে তথা জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। দুর্নীতির অভিযানকে সফল করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ-উদ্যমকে একযোগে কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তবুও এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রাষ্ট্র ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তেমনি সামাজিকভাবেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে আরও কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। সরকার, বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া এবং জনগণ সর্বোপরি তরুণ সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি এমন ধরনের শক্ত আসন গেড়েছে যে, একে চুরমার করে রাতারাতি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বানিয়ে ফেলার কাজটি একেবারে সহজ না। তবে ইচ্ছে থাকলে দেয়াল যত শক্তই হোক তাকে ভাঙ্গাতে হাতুড়ির আঘাতই যথেষ্ট। জেগে ওঠা তরুণরা পারে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে দেশকে রক্ষা করতে। আমাদের চাওয়া না চাওয়ার উপরই নির্ভর করছে দুর্নীতি আমাদের দেশ থেকে নির্মূল হবে কি হবে না। আমরা সমাজ থেকে দুর্নীতির মতো সব জঞ্জাল পরিষ্কার করতে চাই। এই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গেলে আমাদের তরুণদের মাঠে নামতে হবে।

আসুন, সবাই মিলে দুর্নীতিকে ‘না’ বলি।

#

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার